প্রথম আলো

তারিখ 08 JUN 2016
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৩

স্কুল-কলেজ কমিটি গঠনে চাই একজন ইন্দ্রনাথ!

শি ক্ষা প্র তি ষ্ঠা ন

আলী ইমাম মজুমদার

সম্প্রতি একটি রিট আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে হাইকোর্ট বিভাগের একটি বেঞ্চ মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর গভর্নিং বডি ও ম্যানেজিং কমিটি প্রবিধানমালা, ২০০৯-এর কিছু অংশ অবৈধ ঘোষণা করেছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে সাংসদদের নিজ নির্বাচনী এলাকায় স্বীয় বিবেচনায় চারটি প্রতিষ্ঠানের সভাপতি হওয়ার বিষয়টি। ওই আইনবলে সাংসদেরা ইচ্ছে করলেই সদস্য হতে পারতেন। কিন্তু হাইকোর্টের রায় অনুযায়ী কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সভাপতি হতে চাইলে তাঁদের নির্বাচিত হয়ে আসতে হবে।

বিশ্লেষকেরা মনে করেন, এতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে রাজনৈতিক প্রভাব কমতে পারে। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক অধিদপ্তরের (মাউশি) তথ্য অনুযায়ী, দেশে এ ধরনের বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার সংখ্যা প্রায় ৩৭ হাজার। অন্যদিকে সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা পাঁচ শর মতো। তাহলে সহজে অনুমেয় যে দেশের শিক্ষা কার্যক্রমে এ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে। মূলত এগুলো প্রতিষ্ঠিত হয় বেসরকারি উদ্যোগে। তবে এর বিশাল অংশের বেতন-ভাতা প্রধানত সরকারই দেয়। এতে প্রয়োজন হয় বিরাট অঙ্কের টাকা। ভৌত অবকাঠামো নির্মাণেও সরকারি সহায়তা পাচ্ছে অনেক প্রতিষ্ঠান। এসব খরচ যৌক্তিক ও সম্ভব হলে বাড়ানো উচিত। উল্লেখ্য, এসব প্রতিষ্ঠানের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত একটি গ্রহণযোগ্য ও টেকসই প্রবিধানমালা আজও হয়নি।

২০০৯ সালের আগের প্রবিধানমালাতে সাংসদদের বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে সভাপতি হওয়ার কোনো সীমা ছিল না। তিনি যতটিতে খুশি তা থাকতে পারতেন। থাকতেনও অনেকে। কেউ ২০-২৫টি প্রতিষ্ঠানেও সভাপতি হিসেবে থেকেছেন। বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো পরিচালনার জন্য গভর্নিং বডি ও ম্যানেজিং কমিটি গঠন করতে হবে নিষ্ঠাবান ও যোগ্য লোকের সমন্বয়ে। এতে থাকবেন অভিভাবক, শিক্ষক, প্রতিষ্ঠাতা, দাতাদের প্রতিনিধিসহ স্থানীয় শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি।

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর সভাপতি হওয়ার বিধান সময়ান্তরে পরিবর্তন হয়েছে বহুবার। কখনো স্থানীয় প্রশাসনের কর্তাব্যক্তি, জনপ্রতিনিধি এমনকি নির্বাচিত সভাপতিরও বিধান ছিল বা আছে। তবে এ গভর্নিং বডি বা ম্যানেজিং কমিটির ভূমিকায় লিখিত-অলিখিতভাবে পরিবর্তন এসেছে বারংবার। তিন দশক আগেও কমিটি স্কুল-কলেজের আয়-ব্যয়, শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ ইত্যাদি বিষয়াদিই দেখত। খোঁজখবর নিত শিক্ষাদান কার্যক্রম সম্পর্কে। সাধারণত যোগ্য ব্যক্তিরাই নিয়োগ পেতেন শিক্ষক হিসেবে। নিয়োগ পর্বে টাকাপয়সা লেনদেনের কোনো কল্পকাহিনিও শোনা যায়নি।

মাত্র তিন দশকে দেশে শুধু এ ক্ষেত্রটি কত তলানিতে নেমে এসেছে তা অনেকেরই জানা। নিয়োগ-প্রক্রিয়ায় টাকা শুধু রাজনৈতিক ব্যক্তিরাই নেন না। অভিযোগ আছে শিক্ষা বোর্ড ও মাউশি প্রতিনিধি, স্থানীয় সরকারি কর্মকর্তাসহ শিক্ষকদের কেউ কেউ জড়িত থাকেন এ ধরনের কাজে। এটা কার্যত এখন একটা প্রাতিষ্ঠানিক রূপই পাচ্ছে। শুধু সাংসদকে ইচ্ছামাফিক চার প্রতিষ্ঠানের সভাপতি হওয়া থেকে বিরত রাখলেই কি ব্যবস্থাটি ঠিক হয়ে যাবে? এমনটা নিশ্চয়ই কেউ মনে করেন না। আরও অনেক কিছু করার আছে। সমস্যা অনেক গভীরে। তবে উচ্চ আদালতের এ আদেশ একটি বড় সুযোগ সৃষ্টি করেছে। একে কাজে লাগাতে চাই বহুবিধ উদ্যোগ।

গভর্নিং বডি বা ম্যানেজিং কমিটি কীভাবে গঠিত হয় তা অনেকের জানা না থাকতে পারে। বিধিবিধানে কোনো অস্পষ্টতা নেই। সাংসদদের মাঝে সম্মানিত ব্যতিক্রম অনেক আছেন। আবার অনেকেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনা শুধু নয়, সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে দলিল রেজিস্ট্রির সিদ্ধান্ত দেওয়ার ক্ষমতাও নিয়ে নিয়েছেন অলিখিতভাবে।

কয়েক দিন আগে সাংবাদিক সোহরাব হাসান 'নারায়ণগঞ্জে ওসমানীয় শাসন' শিরোনামে *প্রথম আলোতে* একটি উপসম্পাদকীয় লিখেছেন। তাঁকে বিনয়ের সঙ্গে জানাতে চাই, এ ধরনের শাসনব্যবস্থার প্রসার ঘটেছে বাংলাদেশের অনেক স্থানেই। থাকতে পারে আকৃতি ও প্রকৃতির ভিন্নতা। ইতিহাসের সুবে বাংলার সুবেদার একজনই ছিলেন। কিন্তু এখন অনেক আঞ্চলিক সুবেদার নিয়ন্ত্রণ করেন তাঁদের আওতাধীন এলাকা। অনেকটাই নারায়ণগঞ্জীয় কায়দায়। দুই থেকে আড়াই দশক ধরে স্কুল-কলেজগুলোতেও একই ধরনের পরিস্থিতি বিরাজ করছে।

পদাধিকারবলে সভাপতি হতে দেবেন না। কোনো পরোয়া নেই! সুবিধাভোগী স্তাবকেরাই 'জোর করে' নির্বাচিত করবেন তাঁদের। আর বিভিন্ন ক্যাটাগরির নির্বাচন তো থাকে তাঁদেরই নিয়ন্ত্রণে। শুধু নির্ধারিত ব্যক্তির কাছেই মনোনয়নপত্রের ফরম দেওয়া হয়। অন্য কাউকে নয়। আর তা নির্ধারণ করে দেন স্বনিয়োজিত স্থানীয় সুবেদাররাই। এ সিদ্ধান্ত অমান্য করার সাহস স্থানীয়ভাবে কারও নেই। প্রতিবাদ-প্রতিরোধও স্থবির হয়ে গেছে। তাহলে গুণগত পরিবর্তনটা আসবে কীভাবে? আর কাদের মাধ্যমে?

রাজনীতিতেও ভালো লোক আছেন। আছেন সরকারি দলেও। এ ধরনের লোক গভর্নিং বডি বা ম্যানেজিং কমিটি পরিচালনায় সংশ্লিষ্ট হলে দোষের কিছু হয় না। তাঁরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন বিবেক দ্বারা তাড়িত হয়ে। আর এসব সিদ্ধান্তে প্রতিষ্ঠানটির স্বার্থই থাকবে প্রধান বিবেচ্য। তবে দুর্ভাগ্যজনকভাবে এ ধরনের লোকের সামনে আসার সুযোগ দ্রুত কমে যাচ্ছে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির স্বপ্ন পূরণে প্রধান বাধা অকার্যকর স্থানীয় শাসনব্যবস্থা। এটা স্বয়ং অর্থমন্ত্রী বলেছেন জাতীয় সংসদে তাঁর বাজেট বক্তৃতায়। প্রবীণ এ রাজনীতিকের উপলব্ধি বিলম্বে হলেও বিবেচনাযোগ্য। স্থানীয় শাসন আজ পরিপূর্ণ রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণে। তেমনি একইভাবে অনেকটা অকার্যকর হয়ে পড়েছে স্থানীয় সরকারব্যবস্থা। প্রবৃদ্ধির স্বপ্ন পূরণের সঙ্গে শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। আর সে মান উন্নয়নের জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো পরিচালনার অনুকূল পরিবেশের প্রয়োজনীয়তা কেউ উপেক্ষা করতে পারবে না।

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনায় এসব প্রতিষ্ঠান চালানো সম্ভব নয়। সরকার শুধু আর্থিক নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার উদ্দেশ্যে এমপিওভুক্তিসহ মাউশি ও শিক্ষা বোর্ডের মাধ্যমে তদারকির কাজ করে। এখন কেন্দ্রীয়ভাবে শিক্ষক নিয়োগের প্যানেল তৈরির কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে। তবে নিয়োগ-বাণিজ্য তো জেলা-উপজেলা পর্যায়েই সীমিত নেই। রাজধানীতেও আছে। আর আছে ব্যাপক আকৃতি আর প্রকৃতিতে। তা ছাড়া, কেন্দ্রীয়ভাবে প্যানেলভুক্তরা স্থানীয় দূরদূরান্তের প্রতিষ্ঠানগুলোতে কাজ করতে আগ্রহী হবেন কি না কিংবা স্থানীয় চাহিদার সঙ্গে মানিয়ে দিতে পারবেন কি না, তা-ও ভাবার বিষয়।

তবে এ-জাতীয় একটি কার্যক্রম পরীক্ষামূলকভাবে নেওয়া যায়। গভর্নিং বডি বা ম্যানেজিং কমিটি সভাপতি পদে নির্বাচন-সংক্রান্ত হাইকোর্টের রায় সরকার কার্যকর করার পর এসব পদে কারা থাকবেন, তা গভীরভাবে বিবেচনার বিষয়। যেসব স্থানে রাজনৈতিক নেতারা তাঁদের অঞ্চলের সব নির্বাহী দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছেন, সেখানে কী হতে পারে এটা দেখার বিষয়। এর বিপরীতে ভালো কিছু করতে হলে প্রবল রাজনৈতিক প্রত্যয় আবশ্যক। এমনটা কিন্তু লক্ষণীয় হয়নি কোনো সরকারের আমলেই। আইনপ্রণেতাদের একটি অংশ-এসব প্রক্রিয়া থেকে দূরে। তবে তাদের সংখ্যাও ক্রমহ্রাসমান। এ ব্যাপারে রাজনৈতিক দলগুলোর মাঝে কোনো মতপার্থক্যও লক্ষণীয় নয়।

জনপ্রশাসন আগে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো নিয়ন্ত্রণের মূল ভূমিকায় ছিল। এখন এসব প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় এককভাবে নিয়ন্ত্রণ করাটা তাদের সামর্থ্যের বাইরে চলে গেছে। এ ছাড়া দলীয় প্রভাবে তাঁদের অনেকেই প্রভাবিত। সরকারি স্কুলগুলোর কমিটির প্রধান তাঁরাই। সেখানে ভর্তি প্রক্রিয়ায় তাঁদের মাধ্যমেই রাজনৈতিক মহল প্রভাববলয় বিস্তার করে। ক্ষেত্রবিশেষে ভর্তি একটি বাণিজ্য হয়ে পড়েছে। রাজধানীতেও এটা ব্যাপকভাবে লক্ষণীয়। শুধু রাজনীতিবিদ নন এতে সংশ্লিষ্ট থাকেন শিক্ষক, প্রশাসকদের একটি অংশও।

তবে আমরা এ ব্যবস্থার কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করতে পারি না। যোগ্য ও দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের গভর্নিং বডি বা ম্যানেজিং কমিটিতে আনার প্রচেষ্টা নিতেই হবে। হাইকোর্ট সে সুযোগের দুয়ার খুলে দিয়েছে। এখন এটাকে কাজে লাগানোর দায়িত্ব অনেকের। কিন্তু কে করবে, কীভাবে ও কাদের দ্বারা সে প্রশ্নের জবাব মিলছে না। শরৎচন্দ্রের *শ্রীকান্ত* উপন্যাসে জনৈক বহুরূপী বাঘের রূপ ধারণ করে তামাশা দেখাতে গেলে একটি বিভ্রাট বেধেছিল। ভয় পেয়ে ঘরভর্তি মানুষ চিৎকার করছিল, কেউবা হাঁক দিচ্ছিল, 'সড়কি লাও, বন্দুক লাও' বলে। তখন ঔপন্যাসিকের মন্তব্যটি ছিল 'লাও তো বটে, কিন্তু আনেটা কে?' তবে সমস্যাটি সড়কি, বন্দুক ছাড়াই মিটে গেল গ্রামের এক দামাল কিশোর ইন্দ্রনাথের সাহসী পদক্ষেপে।

● **আলী ইমাম মজুমদার: সাবেক মন্ত্রিপরিষদ সচিব।**
majumder234@yahoo.com